সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর:

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

CSO Alliance

সিএসও এ্যালায়েন্স

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর:
আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

গবেষকবৃন্দ

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) *

শাহ মোঃ আহসান হাবীব, অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)

নওশীন নাওয়াল অবন্তী, সাবেক গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

গবেষণা উপদেষ্টা পর্ষদ

রাশেদা কে. চৌধূরী**
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান
ও আহ্বায়ক, সিএসও অ্যালায়েন্স

এহসানুর রহমান
উপদেষ্টা, ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব
হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাক্টরস ইন বাংলাদেশ (নাহাব)

খাইরুল ইসলাম
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ওয়াটারএইড সাউথ এশিয়া

ফারাহ্ কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর
এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

শফিকুল ইসলাম
এশিয়া রিজিওনাল পরিচালক
এডিডি ইন্টারন্যাশনাল

এ.এইচ.এম. নোমান খান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর ডিজ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট

হাসিন জাহান
কান্ট্রি ডিরেক্টর
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

কেএএম মোর্শেদ
সিএসও অ্যালায়েন্স ফোকাল পয়েন্ট
ও জ্যেষ্ঠ পরিচালক, ব্র্যাক

CSO Alliance
সিএসও অ্যালায়েন্স

---

* এই গবেষণার প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন সিপিডি সহকর্মী রাতিয়া রেহনুমা, সাবেক গবেষণা সহযোগী, চৌধুরী ফারিহা, প্রাক্তন প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট এবং এম তানজিম হাসান খান, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট।

** গবেষণা উপদেষ্টা পর্ষদ সামগ্রিক সাচিবিক সহায়তার জন্য সাঈদ আহমেদ, সমন্বয়ক, সিএসও অ্যালায়েন্স সচিবালয় এবং নির্বাহী প্রধান, আইআইডি; সানজিদা রহমান, যুগ্ম পরিচালক, আইআইডি; শারমিন সুলতানা, গবেষণা সহযোগী, আইআইডি; আরাফা আক্তার, গবেষণা সহকারী, আইআইডি; অমিত দাস, কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক এবং সিজুল ইসলাম, কার্যক্রম কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযান-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

প্রকাশক
সিএসও অ্যালায়েন্স

প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৩

সচিবালয়
আইআইডি, বাড়ি বি-১৪৩, লেভেল ১, লেইন ২২
নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোন: (+৮৮০২) ৯৮৩৬১৫৫, ইমেইল: csoa@iid.dev
ওয়েবসাইট: www.csoabd.net

স্বত্ব © সিএসও অ্যালায়েন্স

সকল স্বত্ব সিএসও অ্যালায়েন্স কর্তৃক সংরক্ষিত। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বইয়ের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশকের অনুমোদন ব্যতীত পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা আইনত নিষিদ্ধ।

যোগাযোগ: সাঈদ আহমেদ, সমন্বয়ক, সিএসও অ্যালায়েন্স সচিবালয়

সিএসও অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে পরিচালিত এই গবেষণাটি অ্যালায়েন্সের নিম্নোক্ত সদস্যদের আর্থিক সহায়তায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে:

এশিয়া ফাউন্ডেশন	ব্র্যাক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
এডুকো বাংলাদেশ	আইআইডি

প্রচ্ছদ: সাদিক আহমেদ/এআই ক্রিয়েটিক্স

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৭৪/বি/১ গ্রিন রোড, আরএইচ হোম সেন্টার (৩য় তলা), সুইট # ২৩২-২৩৯, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫-এর অধীনস্ত প্রিন্ট স্টেশন, ৬ হরিশ চন্দ্র বসু রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০-এর সহযোগিতায় মুদ্রিত।

এ প্রকাশনাটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি উৎসর্গীকৃত। ১৯৭১ সালে তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার পথ প্রশস্থ করেছিল। তাঁদের সাহস এবং আত্মত্যাগ এদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে পথনির্দেশক আলো হয়ে থাকবে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নে যাঁরা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন নাগরিক সমাজের সেই নেতৃবৃন্দের জন্য এই গবেষণাটি নিবেদিত। সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও জনমানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে নিজেদের তারুণ্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আদর্শ ও জীবন দর্শন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

মুখবন্ধ

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে চলমান টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ একদিকে যেমন অসংখ্য বিজয়ের মুখ দেখেছে, তেমনই তাকে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ-এর মধ্য দিয়েও যেতে হয়েছে। এ পুরো যাত্রায় নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা যেমন একদিকে পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, তেমনই অন্যদিকে তৃণমূল ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অংশীজন হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছে। জাতির উন্নয়নের জটিল চিত্রপটে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত নাগরিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব অর্জনের পর অসাধারণ এক পথ নির্মাণ করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নাগরিক সংগঠনগুলো স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে জাতীয় প্রচেষ্টার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে জাতি ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থা থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম ও অবদানের কথা খুব কমই জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট রূপায়নের ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, তার ওপর আলোকপাত করার মাধ্যমে এ বইয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের জটিল ও গতিময়তার চিত্রের গভীরে নিরীক্ষণধর্মী অন্বেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রূপান্তরের গতিপথে নাগরিক সংগঠনগুলো কীভাবে প্রভাবিত করেছে, গত পাঁচ দশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সংগঠনগুলো কী কী উন্নয়নমূলক ভূমিকা রেখেছে–এ সংকলনে তার একটি সংক্ষিপ্তসার থাকবে। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলো উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে যেভাবে ভূমিকা রেখেছে, তার বিশদ তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা এর লক্ষ্য। এ বইয়ের অধ্যায়গুলোতে সংগঠনগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ধরন, কার্যক্রম ও পদ্ধতির তত্ত্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের বিবর্তন ও রূপান্তর তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সংস্কারের জন্য জনমত তৈরি করা, শিক্ষাক্ষেত্রে অভিগম্যতা থেকে স্বাস্থ্য, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও

জেন্ডার-সমতার পক্ষে প্রচার চালানো পর্যন্ত নাগরিক সমাজের কাজের প্রভাব আর সুযোগ ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব এ প্রতিবেদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত করবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রতিবেদনে পরিষেবার "প্রবিধান" ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নাগরিক সামজের অ্যাডভোকেসি এ দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করে পৃথক-পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্ত করা হয়েছে। সংগঠনগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, সিএসওদের কর্মকাণ্ডের ওপর পরিচালিত প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রকাশিত গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততার বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার জন্য নির্বাচিত খাত থেকে বিশেষজ্ঞ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই) গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে অন্তত একজন করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)ও করা হয়েছে, যেখানে জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হয়েছে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য অংশীজনদের অবদানের বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে এবং সংকলনে আলাদা-আলাদা স্বত্ত্ব সুরক্ষা করার মধ্য দিয়ে গোটা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক প্রস্তুতির বিষয়টি নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা স্বীকার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিষয়ে বিশদ অধ্যয়ন চালাতে গেলে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এর কারণ হলো, তাদের বহুমুখী কর্মকান্ডের জটিল ধরন ও বৈচিত্র্য। স্থানীয় তৃণমূল-গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সংগঠন পর্যন্ত এ সংগঠনগুলোর ব্যাপ্তি বিস্তৃত। তাদের কার্যক্ষেত্র বৈচিত্র্যময়, যার মধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষা, পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর জন্য বহুবিধ কর্মসূচি অন্যতম। মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে অ্যাডভোকেসি, সহিংসতা (ভায়োলেশন) বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আইনি ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সংস্কারের জন্য লবি করার ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার-সমতা ও নারীর অধিকারের মতো জটিল বিষয়গুলোকে এসব সংগঠন গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছে। সর্বোপরি, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের প্রভাব, অধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নীতির পক্ষে অ্যাডভোকেসি ও সুশাসনের প্রচারে তাদের অবদান লক্ষণীয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা নাগরিক সংগঠনগুলো এবং তাদের ভূমিকাকে একটি একক প্রকাশনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা একটি কঠিন কাজ, যার ফলে অতিসরলীকরণ বা বাদ পড়ার মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। যদি ঐকমত্যে পৌঁছানো যায় এবং পর্যাপ্ত তথ্য থাকে, তা হলে এ ভলিউমে যা যা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, তা পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করা যেতে পারে। নাগরিক সমাজ ও তাদের বিষয়বস্তুর

ব্যাপকতা এ বইয়ের সীমাবদ্ধতার একটি কারণ। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এক প্ল্যাটফর্মে সংগঠনগুলোকে কাজ করতে হয়। বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বইতে বিশদ অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা যুক্ত করেছে। চ্যালেঞ্জগুলো পরস্পর সম্পর্কিত–এটা মেনে নিয়ে নাগরিক সমাজ প্রায়ই একাধিক বিষয়বস্তু নিয়ে যৌথভাবে কাজ করে থাকে। এ সমস্ত বিষয়গুলো এক ভলিউমে তুলে আনতে গেলে বিষয়বস্তুর গভীরতা বা স্পষ্টতার অভাব দেখা দিতে পারে। নাগরিক সংগঠনগুলোর কার্যকলাপের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত বিষয়াদি একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কেননা তাদের কার্যকারিতা, নীতি ও প্রেরণার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রভাবের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আমরা যখন এ অনুসন্ধানটি চালাচ্ছি, তখন আমাদের অবশ্যই সেসব নাগরিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও অগণিত কর্মীদের সম্মান জানাতে হবে, যারা জাতির উন্নয়নে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তাদের একনিষ্ঠতা ও নিরলস প্রচেষ্টা এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, উন্নয়ন অভীক্ষা অর্জনের চেষ্টা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব, যেখানে নাগরিক সমাজের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। এ বইটি তাঁদের জীবন ও দর্শনের প্রতি আলোকপাত করবে, নতুন প্রজন্মকে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩

রাশেদা কে. চৌধূরী
আহ্বায়ক, সিএসও অ্যালায়েন্স

সারসংক্ষেপ

বিশ্ব এখন অনিশ্চিত একটা সময় পার করছে, এমন সময়েও বাংলাদেশ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে বাংলাদেশকে এখন প্রায়ই 'বিস্ময় বাংলাদেশ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। 'স্বল্পোন্নত দেশ' থেকে 'উন্নয়নশীল দেশ'-এর মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার বিষয়টি দেশটির উন্নয়ন মাইলফলকে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের এই উন্নয়নযাত্রায় সহযোগিতামূলক অসংখ্য অবদান রাখার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো অন্যতম সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে, এটাও এখন বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত।

গত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্র, বেসরকারি খাত ও সরব নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো অনন্য অবদান রেখেছে। তবে এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবদানের কথা বিভিন্ন নথিপত্রে স্থান পেলেও নাগরিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা ও অবদানের কথা তেমনভাবে নথিভুক্ত হয়নি। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়ে প্রচার, দারিদ্র্য-বিমোচন, পরিবেশ-সংরক্ষণসহ বহুবিধ পরিমাপযোগ্য সূচকে নাগরিক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগগুলো সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইস্যুভিত্তিক সীমানা যাই হোক না কেন, নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো নীতিনির্ধারণী মহলকে প্রভাবিত করা এবং তৃণমূলের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনের আওতা বাড়ানোর মাধ্যমে উন্নয়ন উদ্যোগের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নাগরিক সমাজ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির (পার্টিসিপেটরি অ্যাপ্রোচ) উদ্ভাবন করেছে, যা সমাজের প্রান্তিক ও নিপীড়িত মানুষের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নের পথ দেখিয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে নাগরিক সংগঠনগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তবে তাদের কাজের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও ঐতিহাসিক পরম্পরার বিষয়ে এখনো বিস্তৃতভাবে গবেষণার বিষয়ভুক্ত করা হয়নি। এসকল সংগঠনের উন্নয়ন-উদ্যোগগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় এভাবে: (ক) রাষ্ট্রীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে যেখানে সরকারি সেবা পৌঁছেনি সেখানে সামাজিক সেবা পৌঁছে দেয়া; (খ) নীতি ও কর্মসূচিগুলো সঠিকভাবে

বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা পরিবীক্ষণ করা ও প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এবং মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদানে রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার আওতায় রাখতে অ্যাডভোকেসি করা; (গ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য নয়–এমন পণ্য ও সেবা সরবরাহে সহায়তা করা; (ঘ) শ্রমিকদের সুরক্ষা, ন্যায্য-বাণিজ্য চর্চার প্রসার এবং পরিবেশের সুরক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়ে বাজারের চলকগুলোকে (ডায়নামিক্স) প্রভাবিত করা; (ঙ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রসার ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করা।

নাগরিক সমাজের কাজের পরিধি যতটা বিস্তৃত, ততটাই কম এর নথি ভুক্ত করার বিষয়টি। এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য, ১৯৭১ সালে অতি কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের গতিশীল উন্নয়নে নাগরিক সমাজের ভূমিকার একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা। বাংলাদেশের উন্নতির অগ্রযাত্রার যে জটিল ও বলিষ্ঠ চিত্র, তার অভ্যন্তরে অন্বেষণ করা এ প্রকাশনার লক্ষ্য, যেখানে দেশের আর্থ-সামাজিক গতিপথ নির্ধারণে নাগরিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণধর্মীভাবে তুলে ধরার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রূপান্তরে নাগরিক সমাজ কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা চিত্রায়িত করতে এ সংকলনে গত পাঁচ দশকে আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে এই সংগঠনগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রমের কী ভূমিকা ছিল–তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং সময় বা স্থান ভিত্তিক সাফল্যের গল্পের পার্থক্য চিহ্নিত করার মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের ধরন ও সুযোগ বিস্তৃতভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তনে সহায়তা করতে ও পরিবর্তন ঘটাতে নাগরিক সমাজ যে সমস্ত উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার একটি বৃহত্তর চিত্র তুলে ধরাই এর লক্ষ্য। অধ্যায়গুলোতে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর ধরন, কার্যক্রম ও পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের বিবর্তন ও রূপান্তরের তত্ত্ব অন্বেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রচার থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী-পর্যায়ে সংস্কার, শিক্ষাখাতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি থেকে জেন্ডার-সমতার প্রসারে নাগরিক সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রকাশনায় একটি সেক্টরভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে পরিষেবার প্রবিধান ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি- প্রধানতঃ এ দুটো বিষয়কেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে সংগঠনগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক নথি অথবা গবেষণাপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি সেক্টর থেকে অন্তত একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে নির্বাচিত সেক্টরে বিশেষজ্ঞ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের যুক্ত করে দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে। সরকার, উন্নয়ন-সহযোগী ও অন্যান্য অংশীজনদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি অংশগ্রহণমূলক প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হয়েছে। দশক ভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি সেক্টরে নাগরিক সমাজের অবদানগুলোকে তাদের সুযোগ ও সম্পৃক্ততার প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

যেহেতু এ গবেষণাটি সংগঠনগুলো থেকে প্রাপ্ত পরোক্ষ সূত্র ও তথ্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে পরিচালিত হয়েছে, তাই এতে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ গবেষণায় পক্ষপাত থাকতে পারে, কেননা যাদের ওপর এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে প্রতিবেদনগুলো সেসব সংগঠনের তৈরি। এসব প্রতিবেদনে তাদের কাজের কেবল নির্দিষ্ট কিছু দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়ে থাকতে পারে। যদিও কেআইআই (কওও) ও এফজিডির (ঋএউ) মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে এসব তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ সীমিত ছিলো। এর কারণ ২০০০ সালের আগে নাগরিক সমাজের অনেক কার্যক্রমের বিবরণ ও তথ্যের অভাব। তাছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনে নাগরিক সমাজের ব্যাপক সম্পৃক্ততা ও অবদানকে একক সংকলনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এটা স্বীকৃত যে, নাগরিক সমাজের ভূমিকা সুবিস্তৃত ও নানামুখী। এতে স্থানীয় পর্যায়ের কমিউনিটিভিত্তিক গ্রুপ থেকে শুরু করে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বহু ধরনের সংগঠন যুক্ত। এ বিস্তৃত খাতের সব ধরনের নাগরিক সংগঠন ও তাদের ভূমিকা একটি বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা দুরূহ। এর ফলে অতি সরলীকরণ ও বাদ পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

নাগরিক সংগঠনগুলোর বৃহৎ আকারে কাজের ধরন ও প্রায়োগিক দিকের ওপর ভিত্তি করে এ প্রকাশনায় যে কয়েকটি থিম্যাটিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ (ক) কৃষিখাতে উন্নয়ন ও খাদ্যনিরাপত্তা; (খ) ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন; (গ) মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন; (ঘ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা; (ঙ) জেন্ডার ও উন্নয়ন; (চ) পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস; (ছ) পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি; (জ) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নः পিছিয়ে পড়াদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা ও সামাজিক আন্দোলন।

কৃষিখাতে উন্নয়ন ও খাদ্যনিরাপত্তা

কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের উদ্যোগসমূহ কৃষিখাতে ব্যবহৃত প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন, জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো, সম্পদ ও প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা, ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রায়ই

কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করে থাকে এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফলন বৃদ্ধি এবং খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে এ সংগঠনগুলো দেশের কৃষিখাতের প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিয়েছে। কৃষকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো, উৎপাদন-পরবর্তী ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং সার্বিকভাবে পরিবেশসম্মত কৃষি-দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক ও কৃষির জন্য চাহিদা ও সম্পদের মধ্যকার ব্যবধান দূর করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ ভূমিকা রেখেছে। কৃষকদের দল, সমবায় সমিতি ও নিজেদের সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক সমাজ কৃষকদের প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে সহায়তা করেছে, যেখানে নিজেদের উদ্যোগ ও দাবি দাওয়া উত্থাপন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, কৃষিখাতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামষ্টিকভাবে করণীয় চিহ্নিত করতে পারে। এসব উদ্যোগ টেকসই কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যকার সামাজিক সংহতি, সহনশীলতা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। নাগরিক সমাজের নানাবিধ পদক্ষেপ কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনমূলক পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করেছে, ফসলের বৈচিত্র্য বাড়াতে উৎসাহিত করেছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলে জলবায়ু-ঝুঁকি মোকাবেলায় কৃষকদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রেখেছে। দরিদ্রবান্ধব কৃষিনীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি করা, সরকারের কৌশলগুলোকে প্রভাবিত করা ও অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে ভূমিকা পালন করেছে। তথ্য প্রমাণভিত্তিক গবেষণা, নীতি বিশ্লেষণ ও অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পরিচালিত প্রচার-প্রচারণায় কৃষিখাতের গুরুত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কৃষির উন্নয়ন-সাধন, খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অভিযোজন দক্ষতা বাড়ানো এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য কার্যকর নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ সরকারি সংস্থা, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে, যা দেশের টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলোতে নাগরিক সমাজ ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ভূমি-অধিকারের মতো কাজে অধিক হারে জড়িত ছিল, যা পরবর্তীকালে পুনর্বাসন-প্রকল্প ও মৎসচাষের উন্নয়ন এবং ১৯৮০ সালের ভূমি-অধিকার আন্দোলনকে জোরদার করার মধ্য দিয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯০ সালে একটি কৃষিখাত ভিত্তিক অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মৎস্য চাষ উন্নয়ন, খাদ্য ও ত্রাণবিতরণ, আদর্শ গ্রাম এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন-সম্পর্কিত ইস্যু। ২০০০ সালের দিকে ফসলের বৈচিত্র্য, জলবায়ু সহনশীলতা ও অভিযোজনমূলক কৃষি, ঘূর্ণিঝড় আক্রান্তদের পুনর্বাসন এবং ভূমি-অধিকার

বিষয়ক ইস্যুগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নাগরিক সমাজের কর্মসূচিতে প্রাধান্য পেয়েছে। এসব কর্মসূচির সাফল্যগাঁথার মধ্যে রয়েছে খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনালের বসতবাড়িতে খাদ্য-উৎপাদন কর্মসূচি (এইচএফপি), দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের আয়বৃদ্ধির জন্য এডিবির অর্থায়নে ব্র্যাকের পোল্ট্রিশিল্পের উদ্যোগ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি-প্রকল্প (এনসিডিপি)-এ এইচভিসি উৎপাদন-প্রযুক্তি এবং কৃষকদের জন্য এইচভিসি-এর আধুনিক প্রযুক্তি।

ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন (এমএফআই)

আর্থিকখাতে অন্তর্ভুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ দেশের এমএফআইগুলোর মধ্যে দৃশ্যমান অবদান রেখেছে। এমএফআইগুলো ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে আসে এবং একত্রিত হয়। সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতে এবং সামাজিক পুঁজি তৈরিতে এমএফআই-এর পদক্ষেপগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা পরিষেবাগুলোতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষকে নিজস্ব ব্যবসা শুরু ও আয় উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। Micro Finance Organisations (এমএফআই)গুলোর ক্ষুদ্রঋণ-কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু, নতুন দক্ষতা অর্জন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উপায় সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে দৃশ্যমান করেছে। এমএফআই-এর কার্যক্রম জেন্ডার-সমতার উন্নয়ন ঘটাতে এবং বাংলাদেশে নারীর সার্বিক সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

এটা লক্ষণীয় যে, ক্ষুদ্রঋণ নিশ্চিত করা; জেন্ডার-বৈষম্য চিহ্নিত করা; মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের পরিমাপযোগ্যতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে প্রচারের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এমএফআইগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো তৃণমূল-পর্যায়ে কর্মসংস্থান-সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি পুঁজির অভিগম্যতা ও দক্ষতা-বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সমাজ দারিদ্র্যবিমোচনে অবদান রেখেছে। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা-বৃদ্ধির উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় বহুবিধ কৌশল শেখানো হয়েছে। এতে করে তাদের উৎপাদনশীলতা ও নানা ধরনের দক্ষতা বেড়েছে এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে মনোযোগ দেওয়ার কারণে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলো কী, তা নাগরিক সমাজ চিহ্নিত করতে পেরেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলো সরবরাহের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ভালো থাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি তৈরী করেছে, যা ওই জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা কমিয়ে আনতে ভূমিকা রেখেছে। এমএফআইগুলো সামাজিক পুঁজি গঠন এবং ক্ষুদ্রঋণের ক্লায়েন্ট ও উদ্যোক্তাদের

মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখে, যা সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

১৯৭০-এর দশকে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির ক্ষুদ্রঋণ-বিষয়ক কার্যক্রম ও উদ্যোক্তা তৈরির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়, যা ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তী দশকে (১৯৯৬-২০০৬) এই উদ্যোগগুলো সবুজ ক্ষুদ্রঋণ (গ্রিন মাইক্রোফিন্যান্স), মাইক্রোফিন্যান্স প্লাস ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবিমা (মাইক্রো হেলথ ইনস্যুরেন্স) ইত্যাদির মাধ্যমে পরিপক্কতা লাভ করে। এর পরের দশকে (২০০৬ থেকে চলমান) ক্ষুদ্রঋণ-কার্যক্রমকে একীভূত করা হয়। ক্ষুদ্রঋণের সাফল্যগাঁথার মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ক্লাসিক মডেল (জিসিএস)। এটি প্রাথমিক বা শুরুর দিকের বছরগুলোতে এ খাতে প্রবেশ করা অন্যান্য এমএফআইগুলো (MFIs) দ্রুতই গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছিল। ব্র্যাকের হলিস্টিক মডেলটি আর্থিক পরিষেবাখাতে অভিগম্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ব্র্যাকের সার্বিক উন্নয়ন-কৌশলের মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এ ছাড়া আশা (ASA)-এর মাইক্রোফিন্যান্স মডেল সাশ্রয়ী বা ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃত হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন

স্বাধীনতা উত্তরকালে নাগরিক সংগঠনগুলো বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে মূলত শিশুশিক্ষা-কার্যক্রমে পর্যবসিত হয়। নাগরিক সংগঠনের মানসম্মত শিক্ষা ও বৃহৎ পরিসরে অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখার মধ্য দিয়ে ২০০১-১০ এর মাঝামাঝি সময়ে সরকারের সঙ্গে অংশীদারির ভিত্তিতে শিক্ষাখাতে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টিতে বাংলাদেশে নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠে। ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, জেন্ডার-সমতার পক্ষে প্রচার, দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরির মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের উদ্যোগ ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রেখেছে। দূর্গম অঞ্চল, বস্তি-এলাকা ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে স্কুল, শিক্ষাকেন্দ্র এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি পূরণ করেছে। অনেক নাগরিক সংগঠনের মূল মনোযোগ ছিল মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের প্রতি। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাধা যা মেয়েদের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেগুলো দূরীকরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে জেন্ডার-সমতার ওপর গুরুত্বারোপের জন্য নাগরিক সংগঠন প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে। এ প্রচেষ্টাগুলো স্কুলে মেয়েদের ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে-পড়া রোধে অবদান রেখেছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন, উদ্ভাবনী

শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়নে কিছু নাগরিক সংগঠন বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে নাগরিক সমাজ শিক্ষাখাতে সংস্কার ও শিক্ষানীতির পরিবর্তনের দাবি তুলে আসছে। নাগরিক সংগঠনের কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, উদ্যোক্তা সহায়তা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন-বিষয়ক পদক্ষেপগুলো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রেখেছে। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে নাগরিক সংগঠনগুলো অভিভাবক, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় অংশীজনদের যুক্ত করেছে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের জড়িত করেছে। এর ফলে একটি সহায়ক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে এবং শিক্ষাকর্মসূচিগুলো টেকসই হয়েছে। নীতি পরিবর্তনের পক্ষে প্রচারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নাগরিক সংগঠন গবেষণা পরিচালনা ও প্রমাণনির্ভর সুপারিশ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষানীতি প্রবর্তন ও শিক্ষাখাতের যুগোপযোগী সংস্কারের পক্ষে নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার ও জনমত তৈরির চেষ্টা করেছে।

স্বাধীনতার পর প্রথম দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো মূলত স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম এবং বয়স্ক সাক্ষরতা উন্নয়ন-কার্যক্রমে যুক্ত ছিল। ১৯৮০ সালে এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে পরিবর্তিত হয়। সরকারের সঙ্গে অংশীদারির ভিত্তিতে চালানো এসব কর্মসূচি পরবর্তী দশকগুলোতে (১৯৮৯-২০০৫) বিস্তার লাভ করে। ২০০৫ সালের পর থেকে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো নাগরিক সংগঠনের কার্যক্রমের একটি প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র হ্রাস, জেন্ডার-সমতার পক্ষে প্রচার এবং দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য নেওয়া উদ্যোগের মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে নাগরিক সমাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। সাফল্যগাঁথার মধ্যে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিএ); ঢাকা আহছানিয়া মিশনের গণকেন্দ্র; গণসাক্ষরতা অভিযান (CAMPE) এর শিক্ষা-পর্যালোচনা প্রতিবেদন (এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট) এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ডেটাবেইজ; বেইস (BACE) এর নারী উপবৃত্তি কর্মসূচি; 'জাগো'র প্রযুক্তি শিক্ষাদান (JAAGO's Technology Schooling); এসএসএস-র ভাসমান স্কুল; ডি নেট-এর কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচি (সিএলপি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা

স্বাধীনতার পর থেকে সচেতনতা কর্মসূচি, এডভোকেসি, পরিষেবা প্রদান ও জনবান্ধব নীতি প্রণয়নে প্রভাবিত করার মাধ্যমে নাগরিক সংগঠনগুলো বাংলাদেশে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক পরিবর্তনগুলোকে চালিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭০-এর দশকে ত্রাণ ও

স্বেচ্ছাসেবক সরবরাহের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এর একটি হলো সাভারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অন্যটি সিলেটের বানিয়াচংয়ে ব্র্যাক। ১৯৮০-এর দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো শহরাঞ্চলে পরিষেবা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করে। ১৯৮৫ সাল থেকে তারা গ্রামীণ অঞ্চলে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। ১৯৯০-এর দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো দেশের এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যার কাছে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা পৌঁছাতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি পুষ্টি কর্মসূচি ও নারীস্বাস্থ্য-বিষয়ক ইস্যুগুলো তারা চিহ্নিত করে। একুশ শতকের প্রথম দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা শুরু করে।

অনেক নাগরিক সংগঠন স্থানীয় কমিউনিটিতে বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকা ও পুষ্টি-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক পরিষেবা প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে "বটম-আপ" পদ্ধতির মাধ্যমে যে পদক্ষেপগুলো সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেগুলো নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হয়। মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি এবং রোগপ্রতিরোধের মতো বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে অনেক নাগরিক সংগঠন জনগণের মধ্যে প্রচার-প্রচারণা, কর্মশালা এবং কমিউনিটিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর ফলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে এবং মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। প্রমাণক তথ্যনির্ভর গবেষণা পরিচালনা এবং জনসচেতনতা-বিষয়ক প্রচারের মাধ্যমে নাগরিক সংগঠনগুলো উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টিকর খাদ্যের সহজলভ্যতা ও কার্যকর জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার পক্ষে নীতি ও প্রবিধান প্রণয়ন এবং সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এডভোকেসি করেছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, টিকার আওতা বাড়ানো, পুষ্টির হার বাড়ানো, পরিবার পরিকল্পনার উন্নতি সাধন এবং স্বাস্থ্য ও ভালো থাকার ক্ষেত্রে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে কমিউনিটির ক্ষমতায়নে নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা অর্থবহ ফলাফল বয়ে এনেছে। সাফল্যগাঁথার ক্ষেত্রে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের (জিকে) ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃত। ১৯৭১ সালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট ফিল্ড হাসপাতালের মাধ্যমে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে) যাত্রা শুরু করে। ব্র্যাকের 'ওরাল থেরাপি প্রোগ্রাম' বাংলাদেশের শিশুদের জন্য পট-পরিবর্তনকারী (গেইম চেঞ্জার) হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৮০-এর দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো শহরাঞ্চলে পরিষেবা প্রদানে মনোনিবেশ করেছিল। ১৯৮৫ সাল থেকে তারা গ্রামীণ এলাকায় সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। ১৯৯০-এ সিএসওরা দেশের এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যার কাছে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। একুশ শতকের প্রথম দশকে নাগরিক

সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করে। সেভ দ্য চিলড্রেন পরিচালিত প্রচারণা 'অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান বন্ধ করুন' (স্টপ আননেসেসারি সিজারিয়ান অ্যাকশন) উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারে সফল হয়। ইউএসএআইডি-এর আইএনসিএ 'কমিউনিটি পদ্ধতির মাধ্যমে পুষ্টির উন্নতি' (ইমপ্রুভিং নিউট্রিশন থ্রু কমিউনিটি অ্যাপ্রোচেস) প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীতীরবর্তী এলাকায় কার্যকর হয়।

জেন্ডার-সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

জেন্ডার-সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃত। ১৯৭২ সাল থেকে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদানে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সংগঠনগুলো ভূমিকা রেখে আসছে। ১৯৮০ থেকে নাগরিক সমাজ নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৯০-এর দশকে নারী-অধিকারের প্রশ্ন ও উদ্বেগগুলো বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ২০০১-১০ এর দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে জেন্ডার-সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে জেন্ডার-সমতা বিষয়ক শিক্ষার প্রসারে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করেছে এবং প্রথাগত জেন্ডার-ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ঋণের সহজলভ্যতা, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, বাজারে সুযোগ-সৃষ্টির মাধ্যমে নারীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তাদের ক্ষমতায়ন ঘটানো এবং নারীদের পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল নাগরিক উদ্যোগের ফলে ধীরে ধীরে নারীদের মধ্যে নিজ পরিবারের ভেতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় বাধা চিহ্নিত করা, প্রজনন অধিকারের বিষয়ে প্রচার এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে নাগরিক সংগঠনগুলোর সচেতনতামূলক প্রচারের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি নারীদের নিজেদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বেশ কিছু নাগরিক সংগঠন বাংলাদেশে নারীবান্ধব আইন প্রণয়ন ও নারীনীতির বিষয়ে প্রাগ্রসর ও সোচ্চার থেকেছে। এছাড়া জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-সমতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইনি সংস্কারের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে নাগরিক সংগঠন অবদান রেখেছে। এর ফলে দেশে আইনি সুরক্ষা ও

ন্যায়বিচারে নারীর অভিগম্যতা বেড়েছে। নাগরিক সংগঠনগুলো কেবল তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলোকেই চিহ্নিত করেছে তা নয়, বরং বৈষম্যমূলক রীতি-নীতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ, সহায়ক ব্যবস্থা (সাপোর্ট সিস্টেম) তৈরি, কমিউনিটিতে নারীদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি (অ্যাজেন্টস অফ চেঞ্জ) হিসেবে তৈরি হওয়ার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছে। ১৯৭০-এর দশককে জেন্ডার-উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিক সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের দশক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরে তা ১৯৮০-এর দশকে নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততায় নারীর ক্ষমতায়নের দশকে পরিণত হয়। ১৯৯০-এর দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী-অধিকারের প্রশ্নে উদ্ভূত ইস্যুগুলো নিয়ে নাগরিক সংগঠনগুলো বেশি নিযুক্ত ছিল। একুশ শতকের প্রথম দশকে তাদের কর্মসূচি অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নীতি-পরিবর্তনকেন্দ্রিক ছিল। সাফল্যগাঁথার মধ্যে 'যৌতুকবিরোধী বিল পাস' উল্লেখ্যযোগ্য একটি অর্জন। এ বিল পাসে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারীপক্ষ ও এএসএফ (অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন) এডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অ্যাসিড সারভাইভারদের চিকিৎসা, আইনি সহায়তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশে দুই আঙুলের ধর্ষণ পরীক্ষা (টু-ফিংগার রেইপ টেস্ট) বাতিলে ব্লাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারীর কর্মসংস্থান ও জেন্ডার-বিষয়ক ইস্যুতে প্রমাণনির্ভর নীতি-গবেষণা কাজে (পলিসি রিসার্চ) সিপিডি গভীরভাবে নিযুক্ত থেকেছে। তাদের গবেষণার মাইলফলক হলো—জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবৈতনিক কাজের অবদান পরিমাপ, পারিবারিক নির্যাতনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি (ইকোনমিক অ্যান্ড সোশাল কস্ট অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স) এবং জেন্ডার বাজেট। এ ছাড়া জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিয়ে বন্ধ ও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে এমজেএফ (মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি-হ্রাস

বাংলাদেশে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে সিএসওদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, যার ফলে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। এসকল ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে—টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ-মোকাবেলার প্রস্তুতি বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে তাৎক্ষণিক জরুরি সহায়তা প্রদানের বিধান। দুর্যোগপ্রবণ এ দেশে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা এবং মোকাবেলায় নাগরিক সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭০-এর দশকে নাগরিক সংগঠনগুলো বিশেষত কয়েকটি বিপর্যয়কর ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ-কার্যক্রম ও পুনর্বাসনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। ১৯৮০-এর দশকে

বন-ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তির বিষয়ে নাগরিক সমাজ অনুপ্রেরণা জোগায়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে পুনর্বাসন ও পরিবেশ এডভোকেসিতে নাগরিক সংগঠনগুলো যুক্ত হয়। দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে লড়াই একুশ শতকের প্রথম দশকের পরে বেশ কিছু সংখ্যক নাগরিক সংগঠনের অন্যতম প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত হয়।

সরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি কাজ করে নাগরিক সংগঠনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবাসহ জরুরি ত্রাণ প্রদান করেছে, দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও ঝুঁকি হ্রাসের পদ্ধতি তৈরিতে অবদান রেখেছে। তদুপরি বনায়ন, জলাভূমি রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংগঠনগুলো কাজ করেছে, যা বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ, বন-উজাড় হ্রাস করা এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রসারে কাজ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ধরনসহ বাংলাদেশের উচ্চ ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক সংগঠনগুলো জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে, জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক নীতির পক্ষে এডভোকেসি এবং অভিযোজন পদ্ধতির বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ সংস্থাগুলো স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে একযোগে জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জলবায়ু-সহনীয় কৃষির ওপর গুরুত্বারোপ এবং কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতির জন্য কাজ করেছে। নাগরিক সংগঠনগুলো নীতি সংস্কারের কথা বলেছে, কমিউনিটির অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করেছে এবং বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায্যতার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। সাফল্যগাঁথার মধ্যে রয়েছে ১৯৭৯ সালে ভোলায় ঘটে যাওয়া ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিডিআরসিএস-এর ঘূর্ণিঝড়-প্রস্তুতি প্রোগ্রাম (সিপিপি), কারিতাসের দুই শতাধিক সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ঘূর্ণিঝড় আম্ফান মোকাবেলায় ‘নিজেরা করি’র ভূমিহীন দলের অভিযোজন দক্ষতা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধ্বসের পর নারী কনসোর্টিয়াম পরিচালিত উদ্ধার-কার্যক্রম ও পুনরুদ্ধার তৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো আইনি লড়াইয়ে বেলা (বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি)-এর অবদান, যার মাধ্যমে ঢাকায় দুই-স্ট্রোক বিশিষ্ট (টু-স্ট্রোক) যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ হয়। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ‘বেলা’ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন)

নিরাপদ পানি, উপযুক্ত স্যানিটেশন-ব্যবস্থাপনা ও উন্নত স্বাস্থ্যবিধি-চর্চার প্রসারের মতো ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে নাগরিক সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

রেখেছে বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে। বাংলাদেশের শুরুর দিকের বছরগুলোতে ওয়াশ (ওয়াটার, স্যানিটেশন, হাইজিন) অবকাঠামোর গুরুতর অভাব ছিল। তখন অক্সফ্যাম ও কেয়ার-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ওয়াশ কর্মসূচির উপাদানগুলোকে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোতে সংযুক্ত করে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ মধ্যকার সময়কে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন দশক (আইডিডবিলউএসএসডি) হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তৃণমূল-পর্যায়ে পানিবাহিত রোগের কারণে অসুস্থতা ও মৃত্যুহারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নাগরিক সংগঠনগুলো সহযোগিতা করেছিল। এ সময়ে "ওয়াশ" প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থা ও নাগরিক সংগঠনের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে দেখা গেছে। বিদেশি সংস্থা (ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও) এবং নাগরিক সংগঠন বা এনজিও সমর্থিত ওয়াশ কর্মসূচিগুলো একুশ শতকের প্রথম দশকে সরকারের তরফ থেকে গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশে নাগরিক সংগঠনগুলো কমিউনিটির অভ্যন্তরে ওয়াশ অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং ওয়াশ অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। নাগরিক সংগঠনগুলোর এ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম কমিউনিটির ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখাসহ ওয়াশ কাঠামো ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কমিউনিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। নিরাপদ সুপেয় পানির উৎস যেমন–নলকূপ, বৃষ্টির পানির মাধ্যমে চাষাবাদ-ব্যবস্থা (রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম) এবং কমিউনিটিভিত্তিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কমিউনিটির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন নির্মাণে সহায়তা দেওয়া এবং বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা ও উন্নত স্যানিটেশন কাঠামোর ধারণাকে প্রচার করেছে। নাগরিক সংগঠনগুলো নীতিগত সংস্কারে ভূমিকা রেখেছে এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ওয়াশ-বিষয়ক নীতি ও বিধিবিধান উন্নত করতে গবেষণা পরিচালনা, তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে এবং ওয়াশ কর্মসূচিতে বিনিয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে নীতি প্রণয়নের পক্ষে প্রচার চালাতে নিজেদের প্রভাব কাজে লাগিয়েছে। অংশীজনদের জবাবদিহিতা ও সমন্বয় বাড়ানোর জন্যও কাজ করেছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দক্ষতা-বৃদ্ধি, অ্যাডভোকেসি এবং পরীক্ষণের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা সুপেয় পানির সহজলভ্যতা, স্যানিটেশন-ব্যবস্থা, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন রপ্ত করা এবং সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য ও দেশের মানুষের ভালো থাকার বিষয়টির বিস্তার ঘটিয়েছে। সাফল্যগাঁথার ক্ষেত্রে সকোমোব প্রকল্পের (এসওসিএমওবি প্রজেক্ট) সাফল্যের কথা বলা যায়, যা এ খাতে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া ভিইআরসি বা ওয়াটারএইড-এর কমিউনিটি পরিচালিত স্যানিটেশন (সিএলটিএস) এবং ইউনিসেফের সহায়তায় পরিচালিত সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট সেন্টার (এসএসি) পদ্ধতি (SAC approach) গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন-পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করা ও সামাজিক আন্দোলন

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সামাজিক আন্দোলনে নাগরিক সংগঠনগুলোর অবদান দেশের উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেন্ডার-সমতা, পরিবেশের স্থায়িত্ব, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উল্লেখযোগ্য, যেখানে সিএসওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আনতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া কমিউনিটির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে নাগরিক সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭০ সাল থেকে নাগরিক সংগঠনগুলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের ইস্যু ও চ্যালেঞ্জগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে নাগরিক সমাজ কাজ করছে, যা ১৯৮০-এর দশকে আধুনিকীকরণ ও আত্তীকরণের কারণে হুমকির মুখে পড়েছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে সংগঠনগুলো হিজড়াদের সঙ্গে কাজ শুরু করে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়।

নাগরিক সংগঠনগুলোর কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবা যুক্ত করা হয়েছে। উপার্জনমূলক কার্যক্রম ও উদ্যোক্তা সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগও তৈরি করেছে। একদিকে নাগরিক সংগঠনগুলো সরকারের উদ্যোগগুলোর সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে, পরিষেবার শূণ্যতা পূরণ করেছে অন্যদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টি দিতে নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এ সংস্থাগুলো তাদের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরও টেকসই ও ন্যায়সংগত সমাজ গঠনে অবদান রেখেছে। নাগরিক সমাজ অতন্ত্র প্রহরীর (ওয়াচ ডগ) ভূমিকা পালন করে চলেছে, দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করেছে এবং আইনের শাসনের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা করে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়—এমন আইন ও নীতি প্রণয়নের পক্ষে নাগরিক সংগঠনগুলোর এডভোকেসি। তাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবন্ধী-অধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে বলা যায়, টিআইবির সিভিক এঙ্গেজমেন্টের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে দ্য কমিটি অফ কনসার্নড সিটিজেন (সিসিসি)। এটি স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি দমন এবং জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছে। চর বা হাওরাঞ্চলে অ্যাকশন এইডের কার্যক্রম; হিজড়াদের বৈধতাদানের বিষয়ে 'বন্ধু'র অ্যাডভোকেসির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে সিপিডির 'দ্য ইনডিপেনডেন্ট রিভিউ অফ বাংলাদেশ'স ডেভেলপমেন্ট' (আইআরবিডি) ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অবদানের বিশ্লেষণ করে, একইসঙ্গে জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করে এবং সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

আগামীর পথরেখা

বর্তমানে নাগরিক সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে সামাজিক সংহতি ও সামাজিক চুক্তির নতুন নতুন ধরন তৈরি হয়েছে। নতুন এ সম্পর্কগুলো, যেমন– অংশীদারিত্ব, জোট ও সহযোগিতার নানা রূপ এবং আন্তর্জাতিক সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুথবদ্ধতা নাগরিক সংগঠনগুলোর কাজের ধরন ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের দিক থেকে নতুন ধরনের ভূমিকা দাবি করে। এ কারণে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নীতি অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং বৈশ্বিক বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে নাগরিক সংগঠনগুলোর কাজের সুযোগ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর (INGOs) কাজের গতিপ্রকৃতি ও সহযোগিতার ধরন বদলে গেছে এবং অর্থায়নের পরিমাণও কমে এসেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অন্য দেশে অধিভুক্ত হওয়ার কারণে এখন এদেশে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সংগঠনগুলোর এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। উন্নয়নের পরিবর্তিত চাহিদা ও বাস্তবতা মাথায় রেখে সামনের দিনগুলোতে নাগরিক সংগঠনগুলোর ভূমিকাতেও পরিবর্তন আনা জরুরী। বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের দলে যোগ দিতে প্রস্তুত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর চুক্তির অধীনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিশেষভাবে ও আলাদা করে যেসব ছাড় ও সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে, ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ সেগুলো পাওয়ার যোগ্যতা হারাবে। উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং টিকে থাকার জন্য সরকার যেসব উদ্যোগ নেবে, সেসব ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের ভূমিকা ও প্রস্তাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার

সম্ভাবনা তৈরি করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণের ক্ষেত্রে যে ধাপগুলো বাকি রয়েছে, সেগুলো অর্জনে বাংলাদেশকে আরও উদ্ভাবনীমূলক ও উৎপাদনশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলো শক্তিশালী সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানবিক খাতে নাগরিক সমাজের ভূমিকার একটি আমূল পুনর্মূল্যায়ন জরুরি। যে ব্যবস্থা মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনা দূর করে, সম্পদ ও সুযোগের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থায় নতুন মূল্যবোধের বিস্তার ঘটিয়ে এবং আর্থিক সংস্থাগুলোকে তাদের কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় এনে নাগরিক সংগঠনগুলো তার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। বিদেশি সাহায্য কমে আসার কারণে পরিবর্তিত এ পরিস্থিতির বাস্তবতা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন নতুন ধরন উদ্ভব হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সে দেশগুলোর স্বল্প আয়ের ও দুর্বল অংশগুলোর জন্য ভবিষ্যতে উপকার বয়ে আনবে কি না। এক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলো এমন একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী এলাকা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, যেখানে একটি বহুত্ববাদী সরকারকাঠামোতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। একইসঙ্গে প্রতিটি স্তরে নাগরিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সিএসওরা ফসল ও অন্যান্য কৃষি-উৎপাদনে এবং খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তবে পরিষেবা প্রদান, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাবিত করা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ খাতের দক্ষতা-বৃদ্ধিতে দেশের নাগরিক সংগঠনের আরও ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে। পাশাপাশি এনএফআইএসবিতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাদের আরও নিবেদিতভাবে এগিয়ে আসা উচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার লক্ষ্য অর্জনে এ সংগঠনগুলোর সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

স্যানিটেশন খাতে আচরণগত পরিবর্তনের অনেক উন্নতি ঘটেছে, তবে টেকসই অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ এখনো পিছিয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে কিছু অংশ বাকি থেকে গেছে, যা আলোচ্য সূচির শীর্ষে রয়েছে। আগামী বছরগুলোতে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ইত্যাদি) সঙ্গে কাজ করা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া আরও নিয়মতান্ত্রিক হওয়া জরুরি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বিশেষত আদিবাসী মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে আরও প্রাধান্য দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সহিংসতার বিরুদ্ধে নাগরিক সংগঠনগুলোর

সোচ্চার থাকার বিষয়টি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে এবং এ বিষয়ে আরও মনোযোগ দেয়ার দাবি উঠবে। শেষ সীমা পর্যন্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী সংযোগের আওতায় নিয়ে আসতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রচার প্রচারণার প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এটি সুস্পষ্ট যে, সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক, আস্থা ও সহযোগিতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়েছে এবং একে আরও জোরদার করা দরকার। আরও কার্যকর যৌথতা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারি ও ব্যবসায়িক অংশীজনদের একত্রিত করতে নাগরিক সংগঠনগুলোর আরও বৃহত্তর চালিকাশক্তি হয়ে ওঠা জরুরি। পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটিকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় ও কর্পোরেট ব্যবসায়ী জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতেও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।